বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চুয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/জুন ২০২৬
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v44i.007

সৈয়দ শামসুল হকের গল্প : মানব-মনস্তত্ত্বের স্বরূপ অন্বেষণ

সুমাইয়া আফরীন সানি*

সারসংক্ষেপ

বিভাগোত্তর কালে বাংলাদেশের ছোটগল্পকে নতুন গতিমুখ প্রদানে সৈয়দ শামসুল হকের অবদান অনস্বীকার্য। পূর্ববাংলার বিকাশশীল মধ্যবিত্তের জীবন ও মননের বিচিত্র বিষয়কে তিনি গল্পের উপজীব্য করেছেন। নর-নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সাপেক্ষে মানবমনের রূপ-রূপান্তরের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর গল্পে। নগরজীবন-কেন্দ্রিক মানুষের দ্বন্দ্ব, সংকট, প্রেম, কাম, বিরহ, নৈঃসঙ্গ্য, মনোবিকার, ভীতি, হতাশা ও আশাবাদকে ধারণ করে রচিত হয়েছে তাঁর অধিকাংশ গল্প। মৃত্তিকাজাত মানুষের মনোগহিনের সমস্যা এবং জটিলতা নিরূপণেও তাঁকে মনোযোগী হতে দেখা যায়। বহুবিধ ঘটনার আলোকে চরিত্রের মনোজগতের স্বরূপ সন্ধান এবং অন্তর্লোকের গতিবিধির যথাযথ উপস্থাপনের প্রয়াস তাঁর গল্পকে সুষমামণ্ডিত করেছে। কিছু নির্বাচিত গল্পের আলোকে পাঠ-বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে সৈয়দ শামসুল হকের গল্পে চিত্রিত নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার স্বরূপ অন্বেষণই বর্তমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

চাবি শব্দ : সৈয়দ শামসুল হক, ছোটগল্প, মনস্তত্ত্ব, নগরচেতনা, প্রেম-মনস্তত্ত্ব, লিবিডোচেতনা, দায়বদ্ধতা।

ভূমিকা

বহুমাত্রিক বিষয় ও অনুষঙ্গকে অবলম্বন করে সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) নির্মাণ করেন বৈচিত্র্যময় গল্পভুবন। তাঁর অধিকাংশ গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের অন্তর্লোকের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সংকট, সংশয়, জীবনাবেগ ও কলহ যেমন তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি গ্রামীণ নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনসংগ্রাম, বঞ্চনা, হতাশাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। সাহিত্যে উপস্থাপিত মানবমনের এরূপ বৈচিত্র্যময় গঠন ব্যাখ্যায় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। মনঃসমীক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি চরিত্রের বিচিত্র আচরণের অন্তর্নিহিত কারণ অনুধাবনের সুযোগ প্রদান করে। এই প্রেক্ষাপটে বিখ্যাত তাত্ত্বিক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) মনঃসমীক্ষণ-তত্ত্ব অবলম্বনে সৈয়দ শামসুল হকের গল্পে বিম্বিত ব্যক্তির অন্তর্গত স্বভাবের স্বরূপ উন্মোচন করা যেতে পারে। এছাড়াও মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড অ্যাডলার (১৮৭০-১৯৪৭), এরিক ফ্রম (১৯০০-১৯৮০) প্রমুখের তত্ত্বের আশ্রয়েও তাঁর মনস্তত্ত্ব-নির্ভর গল্পসমূহ পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে।

সৈয়দ শামসুল হকের গল্পে বিম্বিত মানব-মনস্তত্ত্বের স্বরূপ

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

সৈয়দ শামসুল হক আধুনিকতা ও জীবনচেতনার সমবায়ে দক্ষ কারিগরের মতো তাঁর গল্পের চরিত্রসমূহের অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করেছেন। *তাস* (১৯৫৪), *শীতবিকেল* (১৯৫৯), *রক্তগোলাপ* (১৯৬৪), *আনন্দের মৃত্যু* (১৯৬৭) প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যক্তিজীবনের জটিলতা, ভীতি, নিঃসঙ্গতা, লিবিডোচেতনা ও প্রেমভাবনার ছায়াপাত লক্ষণীয়। বিভিন্ন ঘটনার সাপেক্ষে মানবমনের এসব অনুভূতির রূপ-রূপান্তরের চিত্র উপস্থাপন করেছেন তিনি। তাঁর গল্পসমূহকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে চরিত্রের মানসিক জটিলতার স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

ক. নগরচেতনা-ভিত্তিক গল্প

নাগরিকজীবন ও নগরচেতনার স্বরূপ অন্বেষণ ছিল সৈয়দ শামসুল হকের অন্যতম আগ্রহের বিষয়। শহুরে জীবনের প্রেক্ষাপটে নর-নারীর জীবনজিজ্ঞাসাকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনার চিত্রকে ধারণ করে তিনি যেসব গল্প রচনা করেন, ঐসব গল্পের চরিত্রসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল নাগরিক প্রতিবেশে লালিত। বিভাগপূর্ব কালের কথাকারদের রচনায় চিত্রিত কলকাতা নগর নয় বরং পূর্ববাংলার প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার জীবনচিত্রকে ধারণ করে রচিত হয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের গল্প। ভারত বিভাজনের পর ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে যে একটি নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হচ্ছিল, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তৃত উপস্থাপন ঘটেছে তাঁর লেখায়। 'সৈয়দ হকই প্রথমবারের মতো সেই নাগরিক মধ্যবিত্তের সংকট-সম্ভাবনা, হতাশা-আকাঙ্ক্ষাকে সফলভাবে তাঁর গল্পের উপজীব্য করলেন।'[১] নগরজীবনের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক মানুষের মননে যেসব পরিবর্তন সূচিত হয়– গল্পে তারই দৃশ্যায়ন করেছেন তিনি।

শহুরে নিম্ন-মধ্যবিত্তের দাম্পত্য-বিচ্ছিন্নতার পরিচয় রয়েছে 'রোকেয়ার মুখ' গল্পে। অন্তর্লোকের হীনতা থেকে উদ্ভূত অসহায়ত্ব ও আত্মবিশ্বাসহীনতার ফলে স্বামীর সঙ্গে রোকেয়ার মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব দেখা দেয়। মেয়েদের মনোজগতে সাধারণত শৈশবেই ক্ষুদ্রতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। ফ্রয়েড তাঁর ব্যাখ্যায় একে লিঙ্গ ঈর্ষা (penis envy) বা লিঙ্গের অভাবজনিত হীনম্মন্যতাবোধ (inferiority complex) বলে অভিহিত করেছেন।[২] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' গল্পের যতীনের মানসিক অবস্থার সঙ্গে এ-গল্পের রোকেয়ার ক্ষুদ্রতাবোধের সাদৃশ্য রয়েছে। বসন্ত রোগে রোকেয়ার শারীরিক সৌন্দর্য নষ্ট হলে সংসারে সে নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করে এবং সহজে স্বামীর সামনে দাঁড়ায় না। শুধু হামিদ নয়, বাসায় কোনো আত্মীয় আসলে তার কাছ থেকেও সে নিজেকে লুকাতে চায়। এদিকে প্রতিবেশীর দাম্পত্য সুখ দেখে তার মনে গভীর আলোড়ন জাগে। যদিও স্বামীর দিক থেকে ভালোবাসায় কোনো ঘাটতি ছিল না, তবুও অসুস্থতাবিষয়ক হীনতাবোধের কারণেই তার ভেতর এরূপ পরিবর্তন দেখা যায়। এ-প্রসঙ্গে ফ্রয়েড বর্ণিত তত্ত্বের পাশাপাশি মনোবিদ আলফ্রেড অ্যাডলারের অভিমতও স্মরণযোগ্য :

> অ্যাডলার মনে করেন যে, অনেকেরই মনে থাকে Inferiority Complex বা হীনমন্যতা। এই হীনমন্যতার জন্ম হয় মানসিক কোনো বিষয়ের হ্রস্বতা বা দৈহিক কোনো অস্বাভাবিকতা বা ন্যূনতা (organ inferiority) থেকে, অথবা যৌন বা অন্য কোন সহজাতবৃত্তি যদি নিম্নমানের হয় তা থেকে।[৩]

তাছাড়া এদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নারীর জীবন বরাবরই অনিরাপদ ও অনিশ্চিত হওয়ায় তাদের অন্তর্জগতে অধমর্ণতার বীজ লুকিয়ে থাকে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে উত্থিত নারী-চরিত্র রোকেয়ার কাছে তার শারীরিক সৌন্দর্যই দাম্পত্যজীবনের প্রধান অবলম্বন রূপে বিবেচিত হয়েছিল। বসন্ত রোগের কারণে চেহারায় আপাত কুশ্রীতা যুক্ত হওয়ায় সংসার ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কায় সিঁটিয়ে থাকে সে। অল্পতেই যে বিরাট শঙ্কা ও বিশাল অনিশ্চয়তা বাঙালি মধ্যবিত্তের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, রোকেয়ার মধ্যে তারই উপস্থিতি দেখা যায়। স্বামী-সন্তানসহ নিজের সংসারে কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকার পরও সে অস্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হয়। কন্যাকে নিয়েও তার মনে গোপন ভয় কাজ করে। কেননা মায়ের জীবনে অনিশ্চয়তা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির ভবিষ্যৎও অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে পারে। তবে হামিদ এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র-সামর্থ্য দিয়েই স্ত্রীর মানসিক দুর্বলতা কাটানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। তার দেওয়া উপহার পেয়ে রোকেয়ার মনোজগতে পরিবর্তন দেখা দেয়:

> সে ভাবত, হামিদ আর তাকে ভালোবাসে না; কিন্তু তাকি মনগড়া নয়? হামিদ কি আজ তার জন্যে শাড়ি কিনে আনেনি? আট মাস পরে প্রথম শাড়ি? আর রোকেয়ার সবচেয়ে পছন্দ যে রঙ, সেই বাসন্তি রঙের শাড়িই তো হামিদ কিনে এনেছে।[৪]

হামিদের অনুরাগপূর্ণ আচরণের প্রভাবে রোকেয়ার বোধোদয় ঘটে এবং সে তার পূর্বের আস্থাপূর্ণ জীবনে ফিরে আসে। ব্যক্তির হৃদয়বৃত্তির যথার্থ বহিঃপ্রকাশের ফলে মনোজগতের জটিল সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে, মধ্যবিত্ত জীবনের এই সত্যটিই এখানে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

দেশবিভাগোত্তর সময়পর্বে কৃষিনির্ভর জীবন ছেড়ে নতুন আশায় উদ্বেলিত হয়ে শহরে ভিড় জমিয়েছিল অসংখ্য মানুষ। তবে ভঙ্গুর অর্থনৈতিক বাস্তবতায় অচিরেই এই নবসৃষ্ট নাগরিক সম্প্রদায়ের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। ভয়াবহ দারিদ্র্যের ফলে কখনোও কখনোও তাদের নৈতিক অধঃপতন অতলস্পর্শী হয়। নগরজীবনে লালিত এসব মানুষের প্রত্যাশা, মোহভঙ্গ এবং অবক্ষয়ের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন গল্পকার সৈয়দ শামসুল হক। তাঁর 'শীতবিকেল' গল্পে আনু নামক কিশোরটির মনোভাবনার মধ্য দিয়ে একটি পরিবারের মর্মবেদনা, বিষণ্নতা ও যন্ত্রণার প্রকৃতি নির্দেশিত হয়েছে। সাংসারিক জটিলতা বুঝে ওঠার আগেই তার অনুভবের জগতে পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক দীনতা গভীর দাগ কাটে :

> আমি পানি চাইতে মা বললেন, ফুল কুড়োন হয়ে গেল এরই মধ্যে? ধন্যি ছেলে, নিত্যি নিত্যি ফুল কুড়োন চাই-ই চাই। কি হয় এত শত শিউলি এনে?
> আমি অভিমানহত স্বরে বলি, কেন, সালু আপাই তো বলেছে শিউলির বোঁটা দিয়ে রঙ হয়। সেমাই রঙে তুমি নাকি জরদা করবে।
> মা'র দীর্ঘশ্বাস পড়ে। একটু চুপ করে থেকে তিনি পানি তুলে দিলেন। মা যে কেন চুপ করলেন বুঝতে পারলাম না।[৫]

বালক বয়সে আনুর অনুভূতিতে যে বিষণ্নতা সৃষ্টি হয় তা-ই পরবর্তী সময়ে প্রগাঢ় হয়ে তার মনস্তত্ত্বে বহুভঙ্গিম ভাবনার জন্ম দেয়। টাকার অভাবে বোনদের বিয়ের প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যাওয়ার ঘটনাও তার চেতনাকে প্রভাবিত করে। বাবা কিছুতেই মেয়েদেরকে সৎপাত্র ছাড়া পাত্রস্থ করতে চায় না,

এদিকে পাড়া-প্রতিবেশীদের কথা শুনতে হয় মাকে। বাবা-মায়ের এই অপারগতা ও আত্মগ্লানি আনুকে এমন এক নির্বেদময় জগতের সন্ধান দেয়, যা তার কাছে চেনা হয়েও অনেক অচেনা :

> ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে পেলাম সবাইকে। মা-বাবা, বড়আপা, মেজআপা, সেজআপা আর সকলেইতো রয়েছে। কেমন অচেনা মনে হলো আমার সবাইকে। কাউকে যেন আমি কোনোদিনই চিনতাম না।[৬]

বাড়ির বড় ছেলে পানু রেলেওয়েতে চাকরি পাওয়ার পর আনুদের সংসারের সুখ-স্বপ্নের পালে যেমন হাওয়া লাগে, তেমনি আকস্মিক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হলে আবার গভীর হতাশায় ডুবে যায় গোটা পরিবার। তাছাড়া তখন বাবার মধ্যেও একধরনের আপোশকামী মনোভাব সঞ্চারিত হয়। সৎ ও নীতিবান পুলিশ অফিসার পিতা তার একমাত্র জীবিত পুত্র আনুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের চিন্তায় নৈতিকতাকে বিসর্জন দেয়। ছেলেকে ভালো স্কুলে ভর্তি করানোর উদ্দেশ্যে চার হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণ করে সে। বাস্তবতার আঘাতে পিষ্ট হয়ে এরূপ নৈতিক স্খলনে জড়িয়ে পড়ার প্রতিক্রিয়ায় তার মনস্তত্ত্বে অনিবার্য বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। তাই সামান্য কারণেই স্ত্রী কিংবা ছেলেমেয়েদের ওপর ক্রোধ প্রদর্শন করে সে। ব্যক্তির মনের এরূপ প্রতিক্রিয়াকে মনোবিজ্ঞানে Displacement বা স্থানান্তরকরণ বা পাত্রান্তরকরণ নামে অভিহিত করা হয়। 'এর মূল কথা হচ্ছে কোনো বিশেষ প্রবৃত্তিগত চাহিদাকে তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা এবং ঐ লক্ষ্যবস্তুর প্রতি নির্দিষ্ট আবেগটিকে অন্য বস্তুর প্রতি সঞ্চারিত করা।'[৭] সে কারাবন্দি হলে স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের সদস্যদের প্রতি সরকারি বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ আসে। তারা প্রত্যেকেই তখন উন্মূল, হতাশ ও যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় পতিত হয়। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য– 'সবার ভালোবাসায় সিক্ত পরিবারের আর্থিক উন্নতির জন্যে বাবার ঘুষ নেওয়া আত্মসুখি একটি পরিবারকে প্রবল শীত দিয়ে ঢেকে দিয়েছে।'[৮] ভাগ্য ও নির্মম দারিদ্র্যের কাছে অনন্যোপায় এই পরিবারটির করুণ, অনির্দেশ্য পরিণতির মধ্য দিয়ে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনসংকটের চিত্র বিধৃত হয়েছে এ-গল্পে।

অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় মেয়ের বিষণ্ণ হৃদয়ের আর্তি ব্যক্ত হয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের 'সিঁড়ি' গল্পে। পরিবারের দায়িত্ববোধে পিষ্ট অনূঢ়া জাহানারার নিঃসঙ্গতা ও আত্মবিশ্লেষণই এই গল্পের মূল উপজীব্য। বি. এ. পরীক্ষার আগে বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে পরীক্ষা স্থগিত করে রোজগারের পথ বেছে নিতে হয়েছে তাকে। অসুস্থ বাবা, গৃহিণী মা ও ছোট ভাইয়ের দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার ফলে উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগের যেমন অবসান ঘটে, তেমনি দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করার স্বপ্নও তার অচিরেই বিনষ্ট হয়। এতকিছুর পরও কন্যাসন্তান বলে পরিবারে তেমন কোনও অনুকূল অবস্থান পায় না সে। কাছের মানুষদের প্রয়োজনে নিজেকে সমর্পণ করার প্রতিদানস্বরূপ যে সমীহ-মনোভাব তারা প্রদর্শন করে তাতে সে বিমর্ষ হয়। এখানে শিক্ষা ও উদ্যমের গুণে জাহানারা নিজের পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তার চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষশাসিত রীতি-নীতি মেয়েদেরকে বরাবরই ঘেরাটোপের অন্তরালে রাখতে চায়, তাই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ছেলেদের মতো মর্যাদা পায় না তারা। অনেক সময় নারী নিজেও অনগ্রসর মানসিকতাকে লালন করে, তাই জাহানারার মা মেয়ের উপার্জিত টাকা হাত পেতে গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত হয়। ওষুধ শেষ হওয়ার কথা জানানোর

সময় বাবা যখন অভিনয়ের আশ্রয় নেয় তখন তিক্ততা অনুভব করে জাহানারা। নিজ-পরিবারে তার এই ভঙ্গুর অবস্থান গোটা সমাজের নারীজাতির সামগ্রিক দৃশ্যরূপেরই খণ্ডাংশ। কৈশোরের বান্ধবী রেশমির গুছানো পরিপাটি সংসার দেখে জাহানারার জীবনের ব্যর্থতা ও হতাশার চরায় নতুন প্রলেপ পড়ে। সে ভাবতে থাকে, 'ইস্কুলে যে মেয়ে অ্যালজেব্রার আঁক কষতে গিয়ে হিমশিম খেত, তার হোমটাস্ক থেকে যে খাতা ভরাতো, সেই রেশমি কত বদলে গেছে। বিশ্বাস হয় না।'[৯] রেশমির সঙ্গে প্রতিতুলনায় তার দুঃখবোধ আরও বেড়ে যায়। রক্ত-সম্পর্কীয় মানুষের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করার পরও নিজেকে একলা আর উপেক্ষিত অনুভব করার বাস্তবতায়, একটি যুগল-জীবনের প্রত্যাশা তার কল্পনায় বারবার উঁকি দেয়। এরূপ মনোবৃত্তি প্রসঙ্গে উইলিয়াম ম্যাকডুগাল (১৮৭১-১৯৩৮), রবার্ট এস উড্ওয়ার্থ (১৮৬৯-১৯৬২) প্রমুখ মনোবিদের বক্তব্য স্মরণযোগ্য। তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তি কোনো কারণে বেদনাগ্রস্ত হলে এভাবেই সুখকর বস্তু লাভ করার এবং দুঃখকর বস্তু পরিহার করার প্রতিন্যাস (অ্যাটিচুড্) ও প্রবণতা (টেনডেনসি) তৈরি হয় তার মধ্যে।[১০] জাহানারার বাবা-মাও এটাই ভেবে নেয় যে, অন্যের ঘরে গিয়ে সংসার করাই একটি মেয়ের প্রকৃত দায়িত্ব। কিন্তু পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার কারণে সেই সম্ভাবনাটিও দেখতে না পেয়ে জটিল অবস্থার পাঁকে পড়ে অস্থিরতা অনুভব করে সে।

নব্য-উত্থিত নাগরিক জীবনের প্রেক্ষাপটে বিধবা মায়ের অন্তর্জগতের হতাশা, দুঃখবোধ ও গভীর মনোকষ্ট চিহ্নিত হয়েছে 'তাস' গল্পে। 'এতে একটি নারীর মাতৃত্ব ও নারীত্বের চাওয়া-পাওয়াকে সমান্তরাল রেখায় যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তাতে মনস্তত্ত্বের জটিল বিষয়ে লেখকের সূক্ষ্ম অনুভব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।'[১১] মা তার স্বামীহীন জীবনে পুত্রের উপার্জনে চলা সংসারে কর্ত্রীর ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিল। বিধবা মেয়ে, নাতি-নাতনি ও অন্য ছেলেমেয়ে সবাই তাকে সারাক্ষণ ঘিরে থাকে। তবুও সে সঙ্গীহীনতার বেদনায় দারুণভাবে বিষাদগ্রস্ত হয়। 'অন্ধকার কোনো এক পাথারে তিনি একা। নিঃসঙ্গ। কেউ নেই।'[১২] তাই বিষণ্ন সময়ে স্বামীর আমলের এক দেয়াল ঘড়িকে ঘিরে বিগত সময়ের স্মৃতি-রোমন্থন করে সে। 'বাড়ির একটি পুরানো দেয়াল ঘড়িকে কেন্দ্র করে বিধবা মায়ের যে আবেগ ও স্মৃতি, এক কাতর ও বিষণ্ন আবহে মায়ের সেই মনোবাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।'[১৩] পুরোনো ঘড়িটিকে সে অত্যন্ত আপন মনে করে, কারণ এই যন্ত্রটির সঙ্গে তার দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিককার আবেগ-অনুভূতি ও লজ্জা-চঞ্চলতা মিশে রয়েছে। স্বামী নিজে তাকে এটার সাহায্যে সময় দেখতে শিখিয়েছিল, তাই এর মধ্য দিয়েই স্বামীর প্রতি ভালোবাসা জ্ঞাপন করতে চায় সে। খোকনের মায়ের মনোজগতের এরূপ অনুভূতি ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে বর্ণিত বস্তুকামের সমান্তরালবর্তী। 'অহম-এর সীমানার বাইরে বস্তুজগতের কোনো কোনো ব্যক্তি এবং বিষয় তার কাছে সুখকর এবং প্রিয় হয়ে ওঠে। একেই বস্তুকাম বা অন্যাশ্রয়ী লিবিডো বলে।'[১৪] কালের বিবর্তনে হাতঘড়ি সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় পরিবারে পুরাতন দেয়াল ঘড়ির কদর কমেছে। বিষয়টিকে মা তার স্বামীর স্মৃতির প্রতি অসম্মান হিসেবে বিবেচনা করে। খোকনের হাতে ঘড়ি আছে বিধায় সবাই তার কাছে সময় জানতে চায়। এভাবে মায়ের মনোজগতে পুত্রই মৃত স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিবেচিত হয় :

> এত বড় একটা ঘড়ি থাকতে ঘরের মধ্যিখানে খোকনের কাছে সবাই সময় জানতে হুড়মুড় করে পড়ে কেন, মা ভেবে পান না। অবশেষে কি করে যে নিজের ওপরেই দুঃখ হয় তা তিনি নিজেই বুঝতে পারেন না।[১৫]

দেয়াল ঘড়িটি হঠাৎ বিকল হয়ে পড়লে তাকে ঠিক করার ব্যাপারে খোকনের আগ্রহ দেখতে না পেয়ে মনে মনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয় মা। অকালবৈধব্যের যন্ত্রণায় মায়ের আবেগ একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতেই স্থির হয়ে থাকায় তার মধ্যে এমন অস্বাভাবিক মানসিকতা দেখা দেয়। তাছাড়া স্বামীহীন জীবনে সে পুত্র খোকনের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে চায়। তাই ছেলের কাছে তার চাহিদা সবার আগে মূল্যায়িত হোক এটাই সে প্রত্যাশা করে। পুত্র ও মায়ের মধ্যে গড়ে ওঠা এরূপ অস্বভাবী সংবন্ধনকে (fixation) 'জোকাস্টা কমপ্লেক্স' (Jocasta Complex) নামে অভিহিত করা হয়।[১৬] বেতন বা মাইনে পাওয়ার দিন খোকন স্বেচ্ছায় প্রচুর খরচ করলেও ঘড়ির কারিগর আনতে ভুলে যাওয়া মায়ের চোখে গর্হিত অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। বাসা ভাড়ার টাকা দেওয়া, বিধবা বোন ও মায়ের জন্য কাপড় কিনে আনা, ছোট ভাই-বোনদের স্কুলের বেতন মেটানো খোকনের এসব প্রয়োজনীয় কাজের গুরুত্বও ম্লান হয়ে যায় মায়ের কাছে। তাছাড়া নতুন তাস কিনে এনে তা দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলাকে সে কিছুতেই অনুমোদন করতে পারে না। তাই অন্তর্গত আক্রোশ কমাতে রাতের অন্ধকারে খোকনের ঘরে ছুটে গিয়ে তাসের প্যাকেট ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয় সে। কিন্তু এটাও নিঃসঙ্কোচে করা হয় না, কারণ ঘুমন্ত ছেলের ওপর চোখ যেতেই তার মাতৃত্ব জেগে ওঠে। অনুভবের জগতে সে তখন তার সামনে ছোট বেলার খোকনকেই বিচরণ করতে দেখে। 'প্রিয়জনকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে যদি কোনো বিরুদ্ধভাব মনের অগোচরে থাকে তা হলে অন্তর্দ্বন্দ্ব অতি স্বাভাবিক।'[১৭] এরূপ দ্বন্দ্বই খোকনের মাকে সংকটাপন্ন অবস্থায় নিমজ্জিত করে।

বেকার, চাকরিচ্যুত কিংবা নিম্নবেতনভুক কর্মজীবীর হতাশা, গ্লানি ও অবক্ষয়ের কাহিনি সৈয়দ শামসুল হকের গল্পে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। তাঁর গল্পের এসব চরিত্র নাগরিক বাস্তবতায় গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে ভয়াবহ যন্ত্রণা ভোগ করে। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার চাপে খেই হারানো মধ্যবিত্তের করুণ পরিণতি বিবৃত হয়েছে 'নাম' গল্পে। কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জীবিকা হারিয়ে এক উপায়হীন বাস্তবতার মুখোমুখি হয় এ-গল্পের মূল চরিত্র আশরাফ। আত্মসম্মানবোধ নষ্ট হওয়ার ভয়ে স্ত্রীকেও সে তার চাকরিচ্যুতির কথা জানাতে পারে না। তাই আর্থিক সহযোগিতার জন্য বাল্যবন্ধু হুরমতের শরণাপন্ন হয় সে। দীর্ঘদিন ধরে বেকারত্বের ঘানি টানতে টানতে মনোজগতে তার হীনম্মন্যতা দানা বাঁধে। মনঃসমীক্ষক অ্যাডলারের ধারণা অনুযায়ী, মানুষের জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার তাড়না যদি সমাজের দ্বারা ব্যাহত হয় তাহলে তার মধ্যে এরূপ হীনম্মন্যতাবোধের জন্ম নেয়।[১৮] পদে পদে আশরাফকে বন্ধুটির সাহায্য গ্রহণ করতে হয় বলে একসময় সে নিজের চেতনায় তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। তখন হুরমত হয়ে ওঠে তার স্বপ্নের প্রধান নায়ক। স্বপ্নময়তার পাশাপাশি এই উপকারী বন্ধুটির প্রতি ঈর্ষান্বিত মনোভাবও পোষণ করে সে। কেননা এসএসসি পরীক্ষায় হুরমতের খাতায় গণিতের সমাধান করে দিয়েও ভাগ্যবিড়ম্বনায় সে তারই অনুগ্রহপ্রার্থী হয়েছে। 'ঈর্ষায় তার আঙুলগুলো শক্ত হয়ে উঠে সাঁড়াশীর মতো পাকাতে থাকে। হুরমতের সঙ্গে দূরত্ব কি ভীষণ তা বুঝতে পারে।'[১৯] বিদেশি কোম্পানিতে চাকরির পরীক্ষা দেয়ার জন্য হুরমতের কোট ধার করে নিয়ে তার গায়ের মিষ্টি গন্ধে একধরনের স্বপ্নময়তায় বিভোর হয় আশরাফ। তাই ভাইভা

বোর্ডে তার নিজের নামের পরিবর্তে বন্ধুটির নাম উচ্চারণ করে সে। ফ্রয়েড কথিত 'নির্জ্ঞান' মনের অভ্যন্তরে ব্যক্তির এরূপ ভুলের উৎস নিহিত থাকে। তাঁর তত্ত্বানুযায়ী :

> যিনি সচরাচর ঠিকঠাক কথা বলেন, এরকম কোনও ব্যক্তি মুখ ফসকে ভুল বলতে পারেন (১) যখন তিনি ক্লান্ত বা অসুস্থ, (২) যখন তিনি উত্তেজিত, (৩) যখন তাঁর মনোযোগ অন্য কোনও বিষয়ে কেন্দ্রীভূত।[২০]

পরাশ্রয়ী জীবনে অন্যের সাহায্য নিয়ে চলতে চলতে যে প্রচণ্ড হীনম্মন্যতায় মানুষ আত্মপরিচয় ভুলে যায় তার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে এখানে। এ-প্রসঙ্গে জানা যায় :

> মধ্যবিত্ত জীবনের যন্ত্রণা, অসহায়ত্ব, দারিদ্র্যকে লেখক সৈয়দ শামসুল হক সামান্য একটি ঘটনার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। এই গল্পে লেখক জীবনের না পাওয়ার যন্ত্রণাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন, যা আশরাফের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে উদঘাটন করে।[২১]

গল্পে আশরাফ চরিত্রটি বন্ধু হুরমতের মধ্যেই ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও অর্থের সমন্বয় দেখতে পেয়েছিল। তার নির্জ্ঞান মনের ভেতর সফলতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে সে। সেজন্যই চাকরিদাতাদের সামনে দাঁড়ানোর পর আশরাফের মুখ থেকে এই নামটিই বের হয়ে আসে।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বপ্নময়তার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'হিজল কাঠের নাও' গল্পে। উচ্চবিত্তের উন্নত জীবনের সংস্পর্শে আসার গূঢ়-অভীপ্সায় হামিদা বানু তার মেয়ে শফিনাজকে পুত্র রশিদের 'উঁচু ক্লাসের বন্ধু' আখতারের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়। তার কাছে মনে হয় : 'আখতারের মতো ভালো আর শরীফ ছেলে লাখে মেলে না।'[২২] তাই এই ছেলেটি বাসায় আসলে নিজের সামান্য সঞ্চয় দিয়ে তার জন্য সাধ্যের মধ্যে ভালো নাশতা জোগাড়ের চেষ্টা করে হামিদা। ভাবী জামাতা যেন কোনো কিছুতে অখুশি না হয়, সেজন্য সতর্কতা-স্বরূপ বারান্দা আর উঠোন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখতে হয় তাকে। ঘরের সবচেয়ে ভালো মানের কাপে চায়ের ব্যবস্থা হয় সেদিন। ফ্রয়েড বর্ণিত প্রদর্শনকামের (Exhibitionism) পরিবর্তিত রূপ হিসেবে উপস্থাপিত এসব আচরণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রদর্শনকাম একধরনের মানসিক বিকৃতি যাতে 'রোগী বিপরীত লিঙ্গকে নিজের লিঙ্গ অথবা অন্য কোন কামকেন্দ্র (erogenous zone) দেখিয়ে চরমপুলক বা যৌনানন্দ বোধ করে।'[২৩] শফিনাজের প্রতি আখতারকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে অভাবের সংসারের তুলনামূলক ভালো বস্তুসমূহকে আখতারের সামনে প্রদর্শন করার উদ্যোগ নেয় হামিদা বানু। সে নিজেও একমাত্র 'তোলা-শাড়িটি' পরিধানের মাধ্যমে সম্ভাব্য জামাতার সামনে পরিপাটিরূপে উপস্থাপিত হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের অধিকাংশ মা-ই তাদের কন্যা সন্তানদের ভবিষ্যতের সঙ্গে নিজেদের জীবনকেও মিলিয়ে নেয়। আলোচ্য গল্পের শফিনাজের মাকেও মেয়ের বিয়ের কথা ভেবে এক ধরনের স্বপ্নময়তায় আচ্ছন্ন হতে দেখা যায়।

খ. প্রেমমনস্তত্ত্ব-নির্ভর গল্প

প্রেম একটি সক্রিয় বা ক্রিয়াশীল শক্তি, যা একজন ব্যক্তিকে অপরের সঙ্গে হার্দ্য সম্পর্কে আবদ্ধ রাখে এবং তার নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ দূরীকরণে সাহায্য করে। সান্নিধ্য উপভোগ, আনন্দ

লাভ ও নির্ভরতা প্রাপ্তির প্রয়াসে নর-নারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলে সাধারণত তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। প্রেম-প্রসঙ্গে এরিক ফ্রম জানিয়েছেন :

> মানুষের মধ্যে অপর ব্যক্তির সহিত প্রেমের মিলনে আবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা আর একটিও নাই। ইহাই আদিতম ক্ষুধা, ইহাই মনুষ্যজাতিকে, সম্প্রদায়কে, পরিবারকে ও সমাজকে একত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই মিলনে ব্যর্থ হইলে বাতুলতা কিংবা ধ্বংস অনিবার্য, ধ্বংসটি আত্মবিধ্বংস হইতে পারে কিংবা অপরের ধ্বংসও হইতে পারে।[২৪]

ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার মতো মনস্তাত্ত্বিক প্রপঞ্চসমূহ ব্যক্তির প্রেমচেতনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর বেশ কিছু গল্পে নারী-পুরুষের আকর্ষণ বিষয়ক এসব জটিল অনুষঙ্গ বিশ্লেষণে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। নর-নারীর হার্দ্যিক সম্পর্কের স্বরূপ অনুসন্ধান এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া রূপায়ণে তাঁর সূক্ষ্মতর দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া প্রেমভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি বাস্তববাদী লেখকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাই প্রেম শুধু বিশুদ্ধ আবেগ হিসেবে বিবেচিত না হয়ে, প্রেমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেহ-নির্ভরতাও গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর গল্পে।

নর-নারীর হৃদয়বৃত্তিজনিত দ্বান্দ্বিকতার পরিচয় পাওয়া যায় সৈয়দ শামসুল হকের 'ভালোবাসার গল্প' নামক গল্পে। হুমায়ুন চরিত্রটি সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও, বিনা কারণেই প্রণয়িনী শ্রাবণী এক সময় তাকে উপেক্ষা করে। শুধু তাই নয় ক্ষণিকের মোহে মেয়েটি একজন অখ্যাত সংগীতশিল্পীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তবে দাম্পত্যজীবনে শ্রাবণী তার পূর্বপ্রণয়ীর স্মৃতি বিস্মৃত হতে পারে না কিছুতেই। এমনকি বিয়ের পরমুহূর্তেই সে হুমায়ুনকে হাত ধরে বাড়িতে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল, যা তার মনের দোলাচলবৃত্তিকে প্রকাশ করে। *গৃহদাহ* (১৯২০) উপন্যাসের অচলা চরিত্রের মতো এ-গল্পের শ্রাবণীর মধ্যেও পরস্পরবিরোধী কামনার দ্বন্দ্ব দেখা যায়। মানব-মনস্তত্ত্বে ব্যক্তির এরূপ বৈশিষ্ট্য মূলত 'Polymorphous perverse' বা বহুবল্লভতার কামনা নামে অভিহিত করা হয়। মানুষের অন্তর্গত সত্তায় এর বীজ নিহিত থাকে শৈশবেই। 'Under the influence of seduction, the child may become polymorphous perverse and may be misled into all srots of transgressions.'[২৫] আলোচ্য গল্পে বিয়ের কিছুদিন পরই নিজের মনের দ্বিমুখী প্রবৃত্তির তাড়নায় হাবিবের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটায় শ্রাবণী। অন্যদিকে হুমায়ুন চরিত্রটি দেশ ছেড়ে গিয়ে বিদেশিনীর সঙ্গে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হলেও প্রেয়সীকে বিস্মৃত হতে পারে না। প্রচণ্ড ভালোবাসাকে গোপন রেখে শ্রাবণীর বিয়েতে সাক্ষ্য দেওয়ার স্মৃতি তার অন্তর্জগতে প্রতিনিয়ত পীড়া দেয়। ধীরে ধীরে এই মনোযাতনা এতোটাই চরমে পৌঁছায় যে, জীবনসঙ্গিনীকে পাশে রেখেও স্বমেহনে প্রবৃত্ত হয় হুমায়ুন। স্ত্রীর কাছে অবলীলায় সে এই অস্বাভাবিকতার কারণ ব্যক্ত করে :

> লিন্ডা, আমার অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে, তুমি কি বুঝিতে অক্ষম, তোমার মতো লোভনীয় দেহ যখন বস্ত্রহীন আমার শয্যায় এবং তুমি সম্মত তখন আমি স্বমেহনে সমাপ্তি কেন সন্দেহ করিয়াছি?[২৬]

অবাঞ্ছিত মিলনক্ষণে মনের ভেতর প্রেমাস্পদের ছবি ভেসে উঠলে এভাবে যৌনতায় বাধা সৃষ্টি হতে পারে। যে হাত ধরে শ্রাবণী একদিন হুমায়ুনকে বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, সে-হাতটিই তার লিবিডোর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। হুমায়ুনের আচরণের সঙ্গে ফ্রয়েড বর্ণিত স্বকাম

স্তরের কার্যক্রমের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। 'স্বকামীতায় অদস্ নিজের মধ্যে থেকে নিজেকে ভালোবাসে, কেননা সেখানে তখনও অহং নেই।'[২৭] এ-গল্পে প্রণয়ে ব্যর্থতার ফলে হুমায়ুনের ভেতর যে অস্বভাবী সংবন্ধন জন্মায় তা তার 'অদস্‌কে' নিজ দেহপথের দিকে ধাবিত করে।

পারিবারিক বঞ্চনার অভিঘাত ভুলবার জন্য একনিষ্ঠ দাম্পত্য-প্রেমে থিতু হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং স্ত্রীর মৃত্যুতে এই প্রত্যাশার পরিসমাপ্তিজনিত মর্মবেদনার চিত্রায়ণ ঘটেছে সৈয়দ শামসুল হকের 'প্রথম চুম্বন' গল্পে। মায়ের চুম্বন পাওয়া প্রত্যেক সন্তানেরই জন্মগত অধিকার হলেও, চা বাগানের ম্যানেজার বাণ্টি তার জন্মের পরমুহূর্তেই মাতৃহীন হয়ে শৈশবেই এর স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। এদিকে পুলিশ অফিসার পিতার প্রতি তার রাগ-ক্ষোভের গভীরতা ছিল অতলান্তিক। সাধারণ মানুষের ওপর বাবার অত্যাচার, নিষ্পেষণ ও তাকে বাংলা শিখতে না দেওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ বাণ্টির মনে ভয়ানক সংক্ষুব্ধতার জন্ম দেয়। তার আর কোনো ভাই-বোন ছিল না বিধায় সে কারও সঙ্গে মনের দুঃখ-বেদনা ভাগাভাগি করার সুযোগ পায়নি। পিতার ওপর ও নিজের জন্মের ওপর এই অব্যক্ত-ক্ষোভ ব্যক্তিগত জীবনে তাকে উন্মূল করে তোলে। এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, ছোটবেলায় যেসব ছেলেমেয়ে সুস্থির পারিবারিক পরিবেশ পায় না তারাই পরিণত বয়সে অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়।[২৮] ঢাকায় বসেই ভালো চাকরি জোগাড় করার মতো যোগ্যতা তার থাকলেও, স্বেচ্ছা-নির্বাসন কাটানোর জন্য চা-বাগানের চাকরি বেছে নেয় সে। ব্যক্তিগত জীবনের এই গভীর দুঃখবোধের কারণে স্বাভাবিক নিয়মে দাম্পত্য-সম্পর্কে জড়াতে সে দ্বিধান্বিত হয় :

> আমার মতো বিকট বিদীর্ণ এক ব্যক্তিকে কে গ্রহণ করবে? যে জীবনের ভেতর আমি পতিত সেই জীবনে আমি কাকে টেনে আনব? কি অধিকার আমার আছে আমারই সঙ্গে আমার দুর্ভাগ্য তাকে আমি ভাগ করে নিতে বলব?–তাও একদিন দু'দিনের জন্য নয়, সারাজীবনের জন্যে–[২৯]

পরবর্তী-সময়ে সে তার উন্মূল মানসিকতার কারণেই সামাজিক মানদণ্ডে অধস্তন হিসেবে বিবেচিত আদিবাসী মেয়েকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছে। কোলাহল পরিত্যাগ করে নির্বাসনকে বেছে নেয়া এই যুবক অরণ্য প্রকৃতির আদরণীয়া নারী তারাকে তার জীবনে স্বাগত জানায়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে বাণ্টি তার একাত্মতা খুঁজে পায়, কারণ এরাও তার মতোই জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং প্রাণময়তার স্বাদ থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের অন্তর্গত দুঃখবোধের সঙ্গে সে নিজের কষ্টকে মিলিয়ে নিয়ে জীবনের একটা অর্থ খুঁজে নিতে চায়। তবে বিয়ের অল্প কিছুদিন পরই স্ত্রী তারার মৃত্যুতে সে আবার নতুন দুঃখবোধে পীড়িত হয়ে চাকরিতে ইস্তফা দেয়। আজন্মের দুঃখী বাণ্টি কোলাহলময় নগরীকে একসময় স্বেচ্ছায় ছেড়ে গেলেও, বিষণ্ন মন নিয়ে ঢাকাকেই আবার অরণ্যজ্ঞানে আলিঙ্গন করে। শৈশবে মায়ের চুম্বন সে পায়নি বটে, তবে স্ত্রীর দেওয়া একমুহূর্তের চুম্বনের স্মৃতি তার হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে থেকে যায় চিরকালের জন্য।

দুই জোড়া নর-নারীর পারস্পরিক ভালোবাসার প্রেক্ষাপটে সামরিক শাসনামলের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে 'ফিরে আসে' গল্পে। তায়মুর-এমিলি এবং গল্পকথক-রানার ভালোবাসার স্বরূপ নির্দেশে সমালোচকের মন্তব্য : 'প্রেম এখানে গভীর, কামনা তীব্র, কিন্তু তার চেয়ে বেশি তীব্র বোধহয় একজন লেখকের লিখতে না-পারার বেদনা, একজন শিল্পীর ছবি আঁকতে না-পারার কষ্ট।'[৩০] নারী-পুরুষের প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে ছাপিয়ে লেখক-শিল্পীর বেদনাবোধই গল্পের

আখ্যানে প্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তখন ধর্মভিত্তিক দেশ-বিভাজনের ফলে শোষণ-নির্যাতনের অন্ধকূপে নিপতিত হয়েছিল পূর্ববাংলার অধিবাসীগণ। 'সামরিক শাসনই হলো বুর্জোয়া শাসন-ব্যবস্থার সব থেকে নিকৃষ্ট রূপ। এবং এই সামরিক শাসনের কর্মকর্তারা মূলত ফ্যাসিস্ট চরিত্র সম্পন্ন হতে বাধ্য।'[৩১] ঐ সময় আইয়ুবি শাসন-ব্যবস্থার রোষানলে পড়ে সৃষ্টিশীল মানুষের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটে। তায়মুরের ছবি আঁকতে না পারা, আবদুল্লাহর লিখতে না পেরে বিদেশ চলে যাওয়া– এতসব ব্যর্থতার মূলে ছিল সামরিক শাসনজনিত প্রতিবন্ধকতা। সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থির ঘূর্ণাবর্তে পতিত হওয়ার দরুণ তাদের ব্যক্তিগত জীবনেও হতাশা জাগে। লক্ষ্যের পথে বাধা পেলে ব্যক্তির মধ্যে এরূপ মানসিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে : 'the term frustration refers to the blocking of behaviour that is directed toward a goal.'[৩২] রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে আলোচ্য গল্পের চরিত্রসমূহ ব্যক্তিগত প্রেমে থিতু হতে চেয়েছে। এদের মধ্যে তায়মুর এমিলির কাছে আশ্রয় পেয়ে কিছুটা স্বস্তি খুঁজে নিলেও গল্পের প্রধান চরিত্রটি রানার ভালোবাসার উত্তাপহীনতায় প্রতিনিয়ত বেদনার্ত হয়। মূলত জাতীয় জীবনের টানাপড়েনের ফলে ব্যক্তির মানবীয় অনুভূতির জগতে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, তা-ই এ-গল্পে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

গ. লিবিডোচেতনা-আশ্রিত গল্প

মানুষের সচেতন ও অবচেতন সত্তায় সক্রিয় যৌনানুভূতি এবং ইন্দ্রিয়জ বাসনা রূপায়ণের প্রয়াস রয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের বিভিন্ন গল্পে। বিচিত্র ঘটনার আশ্রয়ে চরিত্রের জৈবপ্রবৃত্তির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তিনি।

'শরবতির পাশ ফেরা' গল্পে শরবতি নামের একজন বিকারগ্রস্ত নারী সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের মাজারের সিঁড়িতে দুপুরবেলায় বস্ত্রহীন অবস্থায় ওপরের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকে। যদিও সে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন, তবুও পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি তাকে রেহাই দেয় না; তার উলঙ্গ শরীরের প্রতি যৌনকাতরতা অনুভব করে উপস্থিত জনতা। এই ঘটনার মাধ্যমে সমষ্টিগত নির্জ্ঞান মনের কামচেতনাকে রূপায়িত করেছেন গল্পকার। 'ব্যক্তির নির্জ্ঞান মনে বিবর্তনগত (phylogenetic) সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং বৈশিষ্ট্যগুলোও বর্তমান থাকে। এই জন্যই বিভিন্ন জাতির জীবনের কতকগুলো মূল বিষয়ের মধ্যে এখনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়।'[৩৩] তেমনিভাবে এখানে সব বয়সের পুরুষ তথা বালক, যুবা, বৃদ্ধ– প্রত্যেকের মধ্যে একই ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত : 'আমরা' নামক জলেশ্বরীর নির্বিশেষ সত্তার মনোময় অনুভূতিলোকই গল্পের কাহিনীস্থল। জলেশ্বরীর সামূহিক দৃষ্টিকোণ-উৎসারিত মনোময় ভাবনা-অনুভূতিগুচ্ছ বিশ্লেষিত হয়েছে গল্পের অধিকাংশ স্থান জুড়ে।'[৩৪] সামূহিক নির্জ্ঞানে নারী একসময় মোহনীয় সত্তাকে অতিক্রম করে চিরায়ত মাতৃমূর্তি নিয়ে হাজির হয়। জলেশ্বরীর সংঘ-জনতা তাই অনুভব করে :

> শরবতির স্তনদুটি পাশ ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ঝুলে পড়ে ; আমাদের জননীরা কতবার পাশ ফিরেছেন, সত্য সত্যই আমাদের জননীরা যেন এখন আবার প্রকাশিত হয়ে পাশ ফেরেন এবং স্বাস্থ্য ও বলের দিকে আহ্বান করেন।[৩৫]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে সমষ্টিগত অবচেতনের অপরাধবোধের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। নারীদের নানাভাবে শোষণ ও ব্যবহার করার সামাজিক অভ্যাসের কারণে সমবেত জনতার মধ্যে এই অনুভূতির জন্ম হয়।

মানুষের লিবিডোতাড়িত মনোবিকারের পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে 'গন্তব্য অশোক' গল্পের কলেজ শিক্ষক সামাদ চরিত্রের মাধ্যমে। বিয়ের প্রথম দিন থেকেই স্ত্রী শিরিনের প্রতি সে অবিবেচনাপ্রসূত আচরণ প্রদর্শন করেছে। তাকে সে শুরুতেই গ্রহণ করে এক ধরনের পীড়নমূলক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। 'একটানে বুকের কাপড় সরিয়ে হঠাৎ কামড় বসিয়ে দাঁতের ভেতরে মাংস রেখে সামাদ তখন অবিশ্রান্ত বলে চলেছিল, তুমি আমার, তুমি আমার।'[৩৬] এই কথাগুলো ছিল তার বিকারগ্রস্ত মনের উক্তি, কেননা জীবনসঙ্গিনীর প্রতি সে নিজেকে মানসিকভাবে সমর্পণ করেনি কখনোই। শিরিনের জন্য কোমল মানবীয় অনুভূতি ধারণ না করেও নিয়মিত উন্মাদের মতো শরীর-ভোগ তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। 'প্রতি রাতেই তাকে সে অধিকার করে নেয় ভয়ানক দ্রুততার সঙ্গে, ক্রোধের সঙ্গে, অন্তহীন সন্দেহের রশিতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে।'[৩৭] শিরিনের শরীরে তীক্ষ্ণ দাঁতের কামড় বসিয়ে অথবা কঠিন মেঝেতে তার শরীর ক্ষতবিক্ষত করে সে উচ্ছ্বসিত হয়। মূলত, স্বভাবে যারা ধর্ষকামী তাদের মধ্যেই এরূপ বিকৃত আনন্দ লাভের প্রয়াস দেখা যায়। ফ্রয়েডের মতে, 'ধর্ষকাম (sadism) অবিমিশ্র আক্রম-বৃত্তি ও কামসুখমূলক বৃত্তির প্রবৃত্তিগত মিশ্রণ।'[৩৮] এরূপ ক্ষেত্রে নারী অথবা পুরুষের মধ্যে কাম মনোভাবের তুলনায় আক্রমণাত্মক-বৃত্তিই বেশি পরিমাণে থাকে এবং চরম অবস্থায় মৃত্যুর মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। শামসুদ্দিন আবুল কালামের (১৯২৬-১৯৯৭) *কাশবনের কন্যা* (১৯৫৪) উপন্যাসে জোবেদার স্বামী আসগরউল্লার মধ্যে এই ধরনের স্যাডিস্ট (saddist) বা ধর্ষকামী মানসিকতা দেখা যায়। আলোচ্য গল্পে একপর্যায়ে সামাদ তার নিজের সহধর্মিণীকে প্রতিপক্ষরূপে বিবেচনা করতে থাকে। যৌন-বিকৃতি বা sexual perversion-এর পাশাপাশি সন্দেহপরায়ণতাও সামাদের ব্যাধিগ্রস্ত মানসিকতার আরেকটি লক্ষণ। কখনও নিজের বন্ধু বা সহকর্মী আবার কখনও বাড়ির হাবা গোবা কাজের ছেলেটিকে ঘিরেও এই সন্দেহ চলতে থাকে। স্ত্রীর প্রতি এই কদর্য সন্দেহপরায়ণতা তার বিকারগ্রস্ত মানসিকতা থেকে উৎসারিত। এরূপ মনোবৃত্তিকে মানব-মনস্তত্ত্বে সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিত্ব (Paranoid Personality) নামে অভিহিত করা হয়। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের আত্মীয়, বন্ধু অথবা সহকর্মীদের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। এরা স্বামী অথবা স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করে দাম্পত্যজীবনকে বিষিয়ে তোলে।[৩৯] গভীর রাতে বিনা কারণে শিরিনকে গোসল করতে বলা, ভিজে কাপড়েই তাকে দাঁড় করিয়ে ঠাণ্ডা দুধ খাওয়ানো প্রভৃতি তার মানসিক বিকৃতিকে নির্দেশ করে। এই গল্পে সামাদের পারিবারিক-জীবনের কোনো পরিচয় নেই। ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে আর নিজে পড়াশোনা করেই তার দিন অতিবাহিত হতো, অন্যদিকে কাজের ছেলেকে দিয়ে চলছিল প্রাত্যহিক সংসার। এভাবে সে মানবীয় সম্পর্ক-বিচ্যুত দিন যাপন করছিল বলে আবেগ-অনুভূতি ও মায়া-মমতার মতো কোমল বৃত্তিগুলো বিকশিত হয়নি তার ভেতর। নব্যউত্থিত নাগরিক মধ্যবিত্তের মধ্যে এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটা শ্রেণি রয়েছে যারা প্রচণ্ড পরিশ্রমে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে কিছুটা পরিবর্তন আনলেও, পারিবারিক পরিবেশের উত্তরণ ঘটাতে না পেরে একাকী দিন যাপন করেছে। সেজন্যই নিজেকে

নিয়ে একধরনের হীনম্মন্যতা থেকে যায় তাদের মনে– যা এই গল্পের সামাদ চরিত্রে লক্ষণীয়। গল্পে শিরিনের সমস্যার মধ্যে অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি মানুষের অসহায়ত্বের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। গরীব বাবা-মা তাদের দায়মুক্তির জন্য কলেজ শিক্ষক পাত্র পেয়ে কোনো খোঁজ-খবর না নিয়েই তাড়াহুড়ো করে সামাদের কাছে সমর্পণ করে তাকে। বিয়ের পর স্বামীর এসব অমানবিক আচরণ সম্পর্কে তাদেরকে জানানোর সুযোগ হয়নি তার। খাল-বিল আর নদী পরিবেষ্টিত ছোট শহরে আত্মীয় বান্ধবহীন জীবনে নিজের দুর্দশার কথা কাউকে বলে দুঃখ লাঘব করারও উপায় ছিল না। যার ফলে সামাদের এই করুণ-পীড়নমূলক আচরণ ক্রমাগত তাকে বিকারগ্রস্ত করে তুলছিল। একটি সুস্থ জীবনের প্রত্যাশায় শিরিন যখন স্বামী-পরিত্যক্তা খালাতো বোন রুবিকে নিজের সংসারে নিয়ে আসে তখন হিতে বিপরীত ঘটে। রুবির ক্রমাগত অমোদ রসিকতায় সামাদকে আকৃষ্ট হতে দেখে শিরিন আরও হতাশায় নিমগ্ন হয়ে হিস্টিরিয়াক্রান্ত রোগীর মতো আচরণ করে। মূলত, সামাদের মানসিক বিকৃতির কারণে শিরিনের মধ্যেও মনোব্যাধি দেখা দেয়। তবে এই মনোরোগ গভীরতর রূপ পাওয়ার পূর্বেই অনির্দেশ্য গন্তব্যে পাড়ি জমায় সে।

দাম্পত্য-বিচ্ছেদের কারণে খসরু নামক চরিত্রটির মানসিক বিপর্যয় ও গভীর আত্মবিশ্লেষণের চিত্র বর্ণিত হয়েছে 'কেননা' গল্পে। স্ত্রী রাফিজার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর সে একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা এড়ানোর জন্য বোনের সংসারে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সেখানেও অন্য কোনো আলোচনায় যুক্ত না হয়ে প্রতিনিয়তই সংসার ভেঙে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানে সক্রিয় থাকে সে। একজন স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর ঘর ছাড়ার পেছনে যেসব কারণ থাকতে পারে তার সবগুলোই খতিয়ে দেখে খসরু; তবে কোথাও কোনো গ্রহণযোগ্য উত্তর না পেয়ে সে ক্ষুব্ধ, রক্তাক্ত ও যন্ত্রণাহত হয়। মনোজগতের এই বিপর্যস্ততায় তার আচার-আচরণেও অস্বাভাবিকতা জন্মে। নিজেকে সে সবার মধ্যে একজন বলে ভাবতে পারে না, বরং সমাজ-বহির্ভূত মানুষ হিসেবেই কল্পনা করে। কোনো কথা সহজে মনে রাখতে না পারা, পরিচিতদেরকে চিনতে কষ্ট হওয়া প্রভৃতিও তার উদ্‌ভ্রান্ত মানসিকতার লক্ষণ। গল্পে গভীর আত্মবিশ্লেষণের ফলে তার বিপর্যস্ত মানসিকতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। মূলত স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির আগেই এ অস্বাভাবিকতার সূচনা ঘটেছিল। স্ত্রী রাফিজা তাকে বিজনেসে, টাকা-পয়সায়, বাড়ি-গাড়িতে 'স্ট্রংলি গোয়িং' হিসেবে দেখতে না পেয়ে দিনের পর দিন বিছানায় অস্বীকৃতি জানিয়েছে। মধ্যবয়সের প্রারম্ভে যৌনজীবনের আকস্মিক সমাপ্তি তার মানসিক অবস্থায় বিরূপ প্রভাব ফেলে, সেও তখন নিজেকে স্ত্রীর কাছ থেকে গুটিয়ে নেয়। এ-অবস্থায় রাফিজার বান্ধবী আরজু তার ফ্ল্যাটে আসলে তাকে 'সেক্সুয়ালি' কল্পনা করেছিল খসরু। যৌনতার স্বাভাবিক প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে তার ভেতরকার লিবিডোর এরূপ বিকৃতি ঘটে। এই ঘটনার সঙ্গে শিশুর যৌন জীবনের শৈশ্নিক স্তরের (Phallic stage) কার্যক্রমের সামঞ্জস্য রয়েছে। 'শৈশ্নিক দশায় যৌনাঙ্গ কামসুখের কেন্দ্র হওয়ায় যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া বা স্পর্শের মাধ্যমে তারা কামসুখ অনুভব করে।'[৪০] আরজুকে সরাসরি 'অ্যাপ্রোচ' করলে যেহেতু পাপ হতো, তাই তাকে ভেবে স্বমেহন করাকেও পরবর্তী সময়ে সে অন্যায় মনে করে। খসরুর মনোলোকে ধর্ষণচিন্তা আর ধর্ষণ তখন একইধরনের অপরাধ হিসেবে বিবেচনা পায়। 'অদস্'-এর কারণে তার মনোজগতে পর-নারীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হলেও, 'অহম' ও 'অতি-অহমে'র প্রভাবে তার ভেতর মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়।

সাধারণত বিবেকবোধসম্পন্ন কারো দ্বারা নৈতিকতা বিরোধী কোনো কাজ সংগঠিত হলে, 'অধিশাস্তা' সক্রিয় হয়ে এভাবে ব্যক্তির মধ্যে অপরাধবোধের জন্ম দেয়। তাছাড়াও :

> অধিশাস্তা যে অহমকে শুধুমাত্র তার কৃতকার্যের জন্য সমালোচনা করে তাই নয়। অহমের চিন্তা ও অভিপ্রায়ের জন্যও তাকে সমালোচনা করে এবং এই চিন্তা ও অভিপ্রায়ের জ্ঞান অধিশাস্তার থাকে বলেই মনে হয়।[৪১]

খসরু তার কল্পনায় স্ত্রীর বান্ধবীর সঙ্গে যে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়েছিল তা তাকে নিদারুণ যন্ত্রণার দিকে ঠেলে দেয়। ভেতরকার এই অপরাধবোধের মধ্যেই তার মনোরোগের উৎস নিহিত ছিল।

ঘ. দায়বদ্ধতা ও অপরাধবোধকেন্দ্রিক গল্প

মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া অশুভ ঘটনা কিংবা ভবিষ্যতের বিপদের আশঙ্কা তার মনে বিভিন্ন অস্বস্তিকর অনুভূতির জন্ম দেয়। এ-প্রসঙ্গে ভয়-ভীতি, গ্লানি-পীড়ন, অনুতাপ-অপরাধবোধ ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ার কথা স্মরণযোগ্য। এরূপ মৌলিক আবেগসমূহ সৈয়দ শামসুল হকের গল্পে বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে।

নাগরিক অবক্ষয়ের আলোকে মানুষের অন্তর্জগতের অপরাধবোধ ও হতাশার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'পরাজয়ের পর' নামক গল্পে। গল্পটির আখ্যানবৃত্তে নীল জামা পরিধানকারী লোকটির ওপর আকস্মিকভাবে চড়াও হয়েছে সাদা জামা পরিহিত এক ব্যক্তি। গল্পকথক তার পেশি শক্তির জোরে এই আক্রমণোদ্যোত লোকটিকে হারিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সে যখন জানতে পারে যে, নীল বসনধারী লোকটি সাদা জামা পরা ব্যক্তির বোনের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিল, তখন তার মনোজগতে বিষাদ কাজ করে। প্রকৃত ঘটনা না জেনে ভুল মানুষকে সমর্থন করার ফলে নিজেকে তার অপরাধী মনে হয়। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে অপরাধবোধ উৎপত্তির দুটি ধরনের কথা জানা যায়। যথা, 'বহিঃস্থ কর্তৃপক্ষের কারণে ভীত হওয়া এবং অন্যটি অধি-অহমকে ভয় পাওয়া থেকে উৎপন্ন।'[৪২] এক্ষেত্রে গল্পকথক তার অধি-অহম বা বিবেককে ভয় পেয়ে বেদনার্ত হয়। অন্তর্গত হতাশার কারণে সেদিন সে নেশাগ্রস্ত হয়, যা তার অপরাধবোধের তীব্রতাকে প্রকাশ করে।

নারী-ঘটিত বিভিন্ন অপরাধের আলোকে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের 'পতন' গল্পে। গোপন পাপের ফলে সৃষ্ট অনুশোচনায় গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র (বাদশা মিয়া), সামাদ, ফজলু ও বেলাল– এই চারজন তরুণই মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়। খারাপ পাড়াতে গিয়ে যদিও সামাদই শুধু দেহপসারিণীর সংস্পর্শ নিয়েছে, তবুও সেই পাপের যন্ত্রণা বাকি তিনজনের অন্তরকেও ভস্মীভূত করে। মূলত, সামাদের বন্ধুত্রয়ের প্রত্যেকেই এই পতিতা নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিল; তাই পরবর্তী সময়ে তারা সবাই ভেতরকার 'ইগো' দ্বারা তাড়িত হয়েছে। এলাকার 'কালা উকিলের' অনুসন্ধানী চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তারা অনুভব করে : 'আমাদের ভেতরে একমাত্র সামাদই বেশ্যার ঘরে গিয়েছে, এখন কালা উকিলের খর দৃষ্টির সম্মুখে সবাই সে দোষে দোষী বলে অনুভব করে উঠি।'[৪৩] অপরাধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকার ফলে সামাদের মনেই সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা জাগে। নৈতিক পদস্খলনের অনুতাপ ভুলবার জন্য সে ধর্মের দ্বারস্থ হয় এবং তার মায়ের কাছে আশ্রয় পেতে চায়। কিছুতেই সে শান্তি না পেয়ে তীব্র অনুশোচনায় হাহাকার

করে বলে : 'পাপ, আমার পাপ, পাপ আমার সর্বাঙ্গে, পাপে আমার শরীর ঘিনঘিনা, অবশ, আমার মৃত্যু হয় না।'[৪৪] এরূপ যন্ত্রণা তখন তার কাছে 'সিফিলিস রোগ' তথা দৈহিক সমস্যারূপে প্রতিভাত হলেও ডাক্তারি চিকিৎসায় তা মনোব্যাধি হিসেবে আখ্যা পায়। বস্তুত, সামাদের 'ইগো' অতিমাত্রায় সচেতন ও সক্রিয় হয়ে তার অন্তর্জগতে যে প্রচণ্ড মানসিক বিক্ষোভ জাগায় তা একসময় দৈহিক বিকারে রূপ নেয়। গল্পকথক তথা বাদশা নিজেও বন্ধুর কৃতকর্মের জন্য অস্বস্তি অনুভব করেছে। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে সে গভীর আত্মবিশ্লেষণে রত হয় :

> আমরা তো সামাদকে বাধা দিই নাই। ফজলু তো দৌড়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। আমিও তো সেই বেশ্যা রমণীর সাক্ষাতে ভীত হয়ে ফজলুর পেছন পেছন ছুটে গিয়েছিলাম। আর বেলাল নিজেও তো সামাদকে ফেলে ছুটে এসে যোগ দিয়েছিলো আমাদের সঙ্গে।[৪৫]

মনস্তাত্ত্বিক এই টানাপড়েনের ফলে বাদশা মিয়ার মনের সচেতন স্তরে উত্থিত হয় তার পূর্বকৃত পাপের স্মৃতি। কোনও এক জোছনা রাতে অচেনা পাঁচজন যুবকের সঙ্গে অসহায় নববধূকে ধর্ষণে সম্পৃক্ত হওয়ার ঘটনাটি তাকে অনুতপ্ত করে। 'লোকচক্ষুর অন্তরালে কৃত পাপ ও অপরাধের জন্য ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে শাস্তি না পেলেও তার মনে তীব্র অনুশোচনার সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণভাবে এটাকে আমরা বিবেকের দংশন বলি।'[৪৬] অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে তাতে নিজে সামিল হয়েছিল বলে বিবেকের দংশনে ভোগে সামাদ। নব-বিবাহিত ফজলুর অন্তর্জগতের বেদনার প্রকৃতি ভিন্নরূপে উপস্থাপিত হয়েছে গল্পে। স্ত্রীর দেহে পূর্বের বলাৎকারের চিহ্ন আবিষ্কার করে নির্বিশেষে সব নারীকে 'মূর্তিমতী পাপ' হিসেবে আখ্যা দেয় সে। যদিও সে জানে এই ঘটনায় মেয়েটির সমর্থন ছিল না, তবুও তাকে সে পাপের ঊর্ধ্বে রেখে বিবেচনা করতে পারে না। শহিদ মুক্তিযোদ্ধার ছেলে শামসুদ্দীনের সহায়তায় গল্পের চরিত্রসমূহের এই মানসিক যন্ত্রণা লাঘব হয়। মানবীয় সম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ভূমিকা প্রসঙ্গে সে যেসব অভিমত দেয়, তাতে তাদের অপরাধবোধের মুক্তি ঘটে।

বিপজ্জনক আবহাওয়ার প্রেক্ষাপটে সফেদ মল্লিক নামক একটি চরিত্রের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে 'কালামাঝির চড়নদার' গল্পে। ঝড়ঝঞ্ঝার রাতে অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী বাবাকে দেখতে যাওয়ার জন্য তার ভেতর অস্থিরতা দেখা দেয়। কালামাঝির কাছে শৈশবের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে অন্তর্জগতের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সে। তার মানসিক অবস্থার স্বরূপ নির্দেশে ফ্রয়েডের নিম্নোক্ত মতবাদটি স্মরণযোগ্য :

> মানুষের জীবনে ভবিষ্যতে যে বিপদ আসছে পূর্বাহ্নে সে বিপদের সম্বন্ধে অতিরিক্ত সজাগ হয়ে ওঠাই উৎকণ্ঠাবস্থার কারণ। মনের গভীর থেকে, চেতনমনে আসতে থাকে ভবিষ্যতের বিপদের সঙ্কেত, বাইরে তারই প্রকাশ দেখা যায়, দুশ্চিন্তায়, উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে।[৪৭]

এই গল্পের শুরু থেকেই পিতার জীবনাবসানের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে গঞ্জের ব্যবসায়ী সফেদ মল্লিক। তাই দুর্যোগ উপেক্ষা করে নৌকা চালানোর জন্য কালামাঝির কাছে বারবার অনুরোধ জানায় সে : 'আমার যাওয়াই লাগবো বুইঝলা মাঝি। বাজান বোধ করি আর বাঁচবো না। নিয়া যাও ভাই, যা চাও দিমু। তোমরা বলে কত ঝড় তুফান পাড়ি দিছাও।'[৪৮] পিতার কাছে যাওয়ার জন্য সে যেই গভীর দায়িত্ব অনুভব করেছে, তা তার নিজস্ব অনুভূতি থেকে উৎসারিত।

ব্যক্তিমানুষের এই উপলব্ধিই মূলত তার দায়িত্ববোধ : 'This involves responsibility […] even for the wars that happen in my time.[৪৯] অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও কালামাঝি তার যাত্রা শুরু করেছিল। তবে মাঝ নদীতে নৌকাডুবিতে সফেদ মল্লিকের মৃত্যু হলে মাঝিটি এক ভিন্নতর সত্যের মুখোমুখি হয়। অন্যদিকে মল্লিকের মৃত্যুপথযাত্রী পিতা বেঁচে ওঠায় মাঝি বিস্ময় অনুভব করে। ক্ষণভঙ্গুর জীবনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মই যে তার বেঁচে থাকার একমাত্র নিয়ামক নয়, এই অনুভূতি জাগ্রত হয় কালামাঝির মনে।

মোজাফফর মিয়া নামক ব্যবসায়ীর অন্তর্গত দায়বোধ ও দায়মুক্তির প্রসঙ্গ শিল্পিত হয়েছে 'হাওলাতের বহি' গল্পে। প্রথমা স্ত্রী আত্মঘাতী হওয়ার পর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণের ফলে মোজাফফরের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। নবাগতা জহরৎ বিবি তাকে বিগত সময়ের যাবতীয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়। তবে সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবনের অধিকারী মোজাফফর মিয়া কিছুতেই নিজের দুঃখময় অতীতকে উপেক্ষা করতে চায় না। রূপবতী স্ত্রী, ব্যবসায়ে সফলতা, সন্তানের জনকত্ব– এতসব প্রাপ্তির ভিড়েও সে প্রতিনিয়ত পূর্বের কৃতকর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। তাই পুরাতন ধারের খাতায় অপরিশোধিত হিসাবে চিহ্নিত ২৭০০ টাকা পাওনাদারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য গভীর উৎকণ্ঠা দেখা দেয় তার মধ্যে। শুধু মূল টাকাই নয়, সুদ সমেত মোট দুই লক্ষ সাত হাজার টাকা সে পরিশোধ করতে চায়। আসলে কার কাছ থেকে সে এই টাকা নিয়েছিল তাও তার মনে নেই। অনেক চেষ্টার পর মোজাফফরের লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্ধার ঘটে। সে মনে করতে পারে যে, দূরসম্পর্কের ফুফাতো বোন আলতা বিবি তাকে তখন টাকা ধার দিয়েছিল। দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত এই আত্মীয়ার কাছে পৌঁছানো ছিল তার জন্য গভীর কষ্টসাধ্য কাজ। কিন্তু এটা করতে না পারলে সেও মানসিক স্বস্তি পেত না। বার্ধক্যে আক্রান্ত শীর্ণকায় রোগগ্রস্ত আলতা বিবিকে প্রাপ্য টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার পর তার দায়মুক্তি ঘটেছে। নিজের অন্তর্লোক তখন নির্মলতায় ছেয়ে যাওয়ায় কাগজের টাকাগুলোই সোনার মোহরে পরিণত হয় : 'হাওলাতের বহি থেকে লাল প্রশ্ন চিহ্নটি মুছে গিয়ে সোনার অক্ষরে লেখা ফুটে ওঠে, এই হোক, এই তবে হোক। পৃথিবীর সমস্ত কাগজ সোনা হয়ে উঠুক।'[৫০] অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ তাঁদের তত্ত্বে ব্যক্তির এরূপ দায়বোধের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে জানা যায় :

> অস্তিত্ববাদী দর্শনে স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বের প্রশ্নটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে স্বাধীন বলে চিহ্নিত করলেও অস্তিত্ববাদীরা কখনো চাননি সে স্বাধীনতা দায়িত্বহীন হোক; এবং দায়িত্বহীন স্বাধীনতার তাঁরা তীব্র বিরোধিতা করেছেন।[৫১]

গল্পটিতে ধার পরিশোধ করার জন্য মোজাফফরের এই দায়বোধ তার স্বাধীন ও স্ব-নির্বাচিত পছন্দ হিসেবে চিহ্নিত। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে একসময় সে ঋণগ্রহণ করলেও তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কেউ তাকে চাপ প্রয়োগ করেনি। এমনকি সে নিজেও দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ঋণের ব্যাপারটি ভুলে ছিল। কোনো একটি সূত্র ধরে তার অবচেতন মনে থাকা এই স্মৃতি চেতন মনে ফিরে আসলে অন্তর্লোকের অস্বস্তিকে এড়াতে না পেরে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে।

সৈয়দ শামসুল হকের 'রুটি ও গোলাপ' গল্পটি ব্যক্তির অপরাধবোধ প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী ধারার রচনা। প্রেমে ব্যর্থতা এবং এ সংশ্লিষ্ট হতাশাবোধের স্বরূপ উপস্থাপিত হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তির নৈতিক উৎকণ্ঠা এখানে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। প্রত্যাশার মানুষকে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলায় গল্পের মূল চরিত্রের ভেতর উদ্যমহীনতা এসে ভর করে। সেজন্যই অসহায় ব্যক্তির ওপর দুর্বৃত্তের অতর্কিত আক্রমণের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও সে কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনি। তবে ঘটনাটি আদালত পর্যন্ত গড়ালে দায় এড়াতে না পারায় তার ভেতর দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কেননা প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে কথা বলতে যেমন সে ভয় পায়, তেমনি বাদীর অসহায়ত্বও তার মনে করুণা জাগায়। একসময় 'সুপার ইগো' অতিমাত্রায় সচেতন হলে সে অন্তর্দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে পারে। গল্পকথকের মনে ঐ সময় যেরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা তার অধিশাস্তার 'নিশ্চিত আদেশের' (Categorical Imperative) অংশ থেকে উৎসারিত। 'শৈশবে শিশু নির্বিচারে যে সব নৈতিক দাবিগুলো আত্মস্থ করে, এটি তারই পরিণতি। Categorical Imperative-এর দাবি যেন অহমকে মানতেই হবে, সেখানে যেন কোন যুক্তি-তর্ক খাটে না।'[৫২] আদালত কক্ষে প্রকৃত ঘটনা উপস্থাপনের মাধ্যমে গল্পকথকের আত্মগ্লানির অবসান ঘটে।

উপসংহার

ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা ও সমাজ অনুসন্ধিৎসার আলোকে মানব জীবনের বিচিত্র অন্ধিসন্ধির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন সৈয়দ শামসুল হক। নাগরিক মধ্যবিত্তের ভুঁইফোঁড় জীবনের বাস্তবতা, অসংগতি ও নির্বেদ তাঁকে স্পর্শ করেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশাভঙ্গের বেদনা, বিকার, আত্মসুখপরায়ণতা ও ভোগবাদী চেতনার সফল রূপকার ছিলেন তিনি। উদীয়মান নাগরিক জীবনের নানামাত্রিক সংস্কৃতির কাছে ভদ্র সমাজের মানুষ কতোটা অসহায় তা তাঁর গল্পে দৃশ্যমান হয়েছে। ব্যক্তির অসংগত ও বিকৃত যৌন-আকাঙ্ক্ষা চিত্রায়ণের পাশাপাশি অবদমিত দেহজ-কামনার মর্মভেদী যন্ত্রণাকেও তিনি ভাষা দিয়েছেন। বিচিত্র বিষাদময় অভিজ্ঞতা-প্রসূত মানুষের মনোব্যাধি ও মনোবিকার রূপায়ণে লেখকের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তির অন্তর্ময় সংঘাত ও সক্রিয় মনোভাবনা রূপায়ণে সৈয়দ শামসুল হক যে অভিনব শিল্পরীতি নির্মাণ করেছেন তা প্রথাবদ্ধ গল্পের ধারায় নতুনতর মাত্রার জন্ম দেয়। গল্পের কাহিনি-গ্রন্থন, ভাষা-শৈলী নির্মাণ, চরিত্র-চিত্রণ ও সময়-বিভাজনে তিনি পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। ব্যক্তির আত্মকথন, স্মৃতি-চারণ ও চেতন-অবচেতনে বিচরণ এই লেখকের শিল্পরীতিকে প্রাগ্রসর করেছে। গল্পের পরিবেশ-প্রতিবেশ চরিত্রের মনোজাগতিক অবস্থার প্রতিফলক হিসেবে রূপায়িত হয়েছে। বিষয়-বৈচিত্র্য এবং রচনারীতির শৈল্পিক-বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলাদেশের ছোটগল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন সৈয়দ শামসুল হক।

তথ্যনির্দেশ

১ আহমাদ মোস্তফা কামাল, *বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার*, শুদ্ধস্বর, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৩৪
২ সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা* (অনুবাদক : পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র), নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২৬
৩ অরুণকুমার রায়চৌধুরী, *অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ২০০০, পৃ. ১১৮
৪ সৈয়দ শামসুল হক, *গল্পসমগ্র-১ সৈয়দ শামসুল হক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৪১
৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৭ সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা* (অনুবাদক : সাজিদ হাসান), ঐশী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬৮
৮ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, 'সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম গল্পগ্রন্থ তাস', *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ-ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো...* (সম্পাদক : হায়াৎ মামুদ ও পিয়াস মজিদ), চারুলিপি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৩৯৫
৯ সৈয়দ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
১০ পরেশনাথ ভট্টাচার্য, *মনোবিদ্যা*, মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৪৯
১১ আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৫৭
১২ সৈয়দ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
১৩ চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ (১৯৪৭-১৯৯৬)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১০৩
১৪ শুভ্রাংশু আদিত্য, 'প্রেম প্রসঙ্গে ফ্রয়েড', *সিগমুন্ড ফ্রয়েড* (সম্পা : পুষ্পা মিশ্র), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৪৭
১৫ সৈয়দ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
১৬ Roeckelein Jon E., *Elsevier's dictionary of psychological theories*, Elsevier, USA, 2006, p. 102
১৭ মানস রায়চৌধুরী, *লোকজীবন মনস্তত্ত্ব শিল্পসৃষ্টি*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৭১
১৮ পরেশনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৯
১৯ সৈয়দ শামসুল হক, *গল্পসমগ্র-১ সৈয়দ শামসুল হক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭
২০ সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *ভুল ও অন্যান্য* (অনুবাদক : ভব রায়), দীপায়ন, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৩
২১ মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৮
২২ সৈয়দ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
২৩ অরুণকুমার রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯
২৪ এরিক ফ্রম, *প্রেম : দার্শনিক বিচার* (অনুবাদ : জিতেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার), হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২২
২৫ Fordham, *An Introduction to Jung's Psychology*, Penguin Books, UK, 1956, p. 21
২৬ সৈয়দ শামসুল হক, *গল্পসমগ্র-৩ সৈয়দ শামসুল হক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২৬৯
২৭ সুনীল কুমার সরকার, *ফ্রয়েড*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪৮
২৮ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ*, পাভলভ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ২০১৭ পৃ. ২৬৯
২৯ সৈয়দ শামসুল হক, *গল্পসমগ্র-৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
৩০ আহমাদ মোস্তফা কামাল, 'আমাদের সৈয়দ হক : এক উজ্জ্বল যতিচিহ্ন', *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ-ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো...*(সম্পাদক : হায়াৎ মামুদ ও পিয়াস মজিদ), চারুলিপি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৪৬৫
৩১ বদরুদ্দিন উমর, *সামরিক শাসন ও বাঙলাদেশের রাজনীতি*, প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১০১
৩২ Morgan Clifford T. & King, Richard A., *Introduction to Psychology*, McGraw Hill Education Private Limited, India, 1993, P. 252
৩৩ সুনীল কুমার সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
৩৪ চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ (১৯৪৭-১৯৯৬)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৫৩
৩৫ সৈয়দ শামসুল হক, *গল্পসমগ্র-৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩

৩৬ সৈয়দ শামসুল হক, *গল্পসমগ্র-১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫
৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬
৩৮ সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা* (অনুবাদক : পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
৩৯ ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী, *মনের বিকার ও প্রতিকার*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৫২
৪০ সিগমুন্ড ফ্রয়েড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৪১ সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা* (অনুবাদক : সাজিদ হাসান), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪
৪২ সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *সভ্যতার অসন্তোষ* (অনুবাদক : আলীফ হোসেন), সংহতি প্রকাশন, ঢাকা. ২০০৯, পৃ. ১০৯
৪৩ সৈয়দ শামসুল হক, *গল্পসমগ্র-২ সৈয়দ শামসুল হক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২৮
৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৪৬ মঞ্জুর আহমদ, *অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬৩
৪৭ অরুণকুমার রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
৪৮ সৈয়দ শামসুল হক, *গল্পসমগ্র-১ সৈয়দ শামসুল হক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২
৪৯ Blackhan H. J., *Six E-xistentialist thinkers*, Routledge & Kegan Poul Ltd., London, 1961, p. 31
৫০ সৈয়দ শামসুল হক, *গল্পসমগ্র-৩ সৈয়দ শামসুল হক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩
৫১ নীরুকুমার চাকমা (১৯৮৩), *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩০
৫২ সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা* (অনুবাদক : সাজিদ হাসান), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০